ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

লোককবি দুদ্দু শাহ্‌র গান: সমাজ নৃতত্ত্ব ও যুক্তিবোধ বিশ্লেষণ

রওশন জাহিদ*

সারসংক্ষেপ: অনন্য সাধারণ লোককবি দুদ্দু শাহ্ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে গান রচনা করেছেন। সমাজ অভ্যন্তরস্থ নানাবিধ কথা তিনি অবলীলায় প্রকাশ করেছেন। সমাজ ও ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছেন। সামাজিক অসঙ্গতি, ধর্মীয় সমাধান, সমাজ নেতার আচরণ ও ধর্মীয় ঐতিহাসিক শিক্ষা বিষয় হিসাবে তাঁর গানে প্রতিফলিত। আক্ষরিক অর্থে বিভিন্ন দেশের জ্ঞান না থাকলেও 'আপন ভুবন' সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের অভাব ছিল না। জাতিগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক তথ্য ব্যবহারে তিনি উদার। মানবীয় গুণাবলিতে সমুজ্জ্বল লোককবি দুদ্দু শাহ্ অকাট্য যুক্তির বন্ধনে সমস্যার সমাধানে পারদর্শী।

এক

জন্মলাভ থেকে মৃত্যু–এই সময়ে মানুষ নিজেকে স্মরণীয় বরণীয় করে তোলে তাঁর কর্ম-চিন্তা-আদর্শের মাধ্যমে। দুদ্দু শাহ্ বাউল সম্রাট লালন শাহ্‌র শিষ্য। কর্ম-চিন্তা ও আদর্শে বাউল দুদ্দু শাহ্ যুক্তির বন্ধন ও আদর্শিক বিশ্লেষণে জীবনধারণ করেছেন। জীবন ঘনিষ্ঠ সাহিত্যের আশ্রয়ে দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। ধর্ম ও ইতিহাসের উপাদান ভিত্তিক উপস্থাপন সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের আধুনিক গবেষণার খোরাক যোগায়। দুদ্দু শাহ্‌র গানে প্রতিফলিত সামাজিক ইতিহাস, নৃতাত্ত্বিক উপাদান, দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণ, যুক্তির বন্ধন, ধর্মবোধ এই প্রবন্ধে অন্বিষ্ট ।

দুই

গানের ছত্রে ছত্রে গুরু হিসেবে লালন শাহ্‌র নাম প্রমাণ করে যে দুদ্দু শাহ্ ছিলেন তাঁর উপযুক্ত সাক্ষাত শিষ্য। মনের কথা, ভাবের কথা, তত্ত্ব জ্ঞানের কথা, সামাজিক পরিবেশ-প্রতিবেশের কথা, জীবন ভিত্তিক সমস্যা ও তার সমাধানের কথা, দর্শন ও যুক্তির কথা অবলীলায় তিনি গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। 'প্রথা অনুসারে যৌনবৃত্তি, রতিসুখ, মানবিকতা, ঈশ্বরের পূজক ছিলেন দুদ্দু শাহ্। তাঁর মনের ভূগোল সংস্কৃতি সংশ্লেষণের পরিমাপে গড়া, তাঁর সব-পেয়েছির দেশ যেখানে, সেখানে যৌন প্রতীকের পাশাপাশি জ্বলজ্বল করে নবী ও কৃষ্ণ, রতিসুখ চৈতন্যকে শোধন করে, সেখানে নারী কামকূপ এবং একই সঙ্গে উপাস্যও। দুদ্দু শাহ্‌র মানসিকতা বাউল মতবাদেরই সৃষ্টি।'[১] দুদ্দু শাহ্ যেহেতু লালন শিষ্য সেহেতু তাঁকে বাউল বলতে খুব বেশি যুক্তির বিস্তার করতে হয় না। তারপরও দুদ্দু শাহ্‌র বাউল হিসেবে পরিচিতি লাভে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে তাঁর গান। বাউল দর্শনের অর্গলহীন বন্ধনই দুদ্দু শাহ্‌র প্রথম ও প্রধান পরিচয়।

* সহকারী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

'দুদ্দু শাহ্‌র দাদার নাম কাবিল মণ্ডল, পিতা ঝড়ু মণ্ডল। দুদ্দু শাহ্‌র অপর নাম দুধ মণ্ডল ওরফে দুধ মল্লিক বিশ্বাস।'[২] বাউল কবি দুদ্দু শাহ্‌র পিতার নাম জানলেও মাতা ও মাতামহের ঠিকানা জানা যায়নি। পিতা ও পিতামহের পরিচয় সম্পর্কে তেমন কোন বিতর্কের অবতারণা না হলেও বিতর্কযুক্ত নানা তথ্যের মাধ্যমে তাঁর জন্মস্থান ও জন্মকাল বিতর্কিত হয়েছে। অবশ্য গবেষকগণের চেষ্টায় সে অবস্থা বেশি দিন টিকে থাকেনি। এ সম্পর্কিত গবেষণার প্রারম্ভে ধারণা ছিল যে 'কুষ্টিয়া, যশোর, ঝিনাইদহ কিংবা রাজবাড়ীর কোন এক স্থানে তাঁর বসত বাড়ি।'[৩] পরে জানা যায় যে, 'দুদ্দু শাহ্‌র জন্মস্থান বৃহত্তর যশোর জেলার (অধুনা ঝিনাইদহ জেলা) হরিণাকুণ্ডু থানার (এখন উপজেলা) হরিশপুরের পূর্ব পার্শ্ব-সংলগ্ন বেলতলা গ্রাম।'[৪] গবেষকগণ দুদ্দু শাহ্‌র জন্মস্থান সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দেশ-কাল-সমাজের সমস্যা-সমাধান ও বাস্তবতার নানা কথা বললেও দুদ্দু শাহ্‌ নিজ আবাস সম্পর্কে তাঁর গানে বা অন্য কোথাও এমন কিছু বলেননি যা আমরা প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করতে পারি। তবে একটি গান বিশ্লেষণ করলে তাঁর ইহলৌকিকতার কাল সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব।

যথা হোতে প্রতিমা পূজার সৃষ্টি
ভূগোল ইতিহাস দেখে করো রে নির্ণয়।
শৃগালমুখো মূর্খ বামন
না জেনে ব্রহ্মের কারণ
নোড়া পূজার করে প্রচলন, দেখি তায় কয়।।
না জেনে পুরুষ প্রকৃতি
শিবলিঙ্গ পূজে হয় সতী
শুনে হাসি, দেখি এ রীতি, যত শিক্ষিত সবায়।।
'সতীদাহ' বলে যারে
তা কি মনুষ্যে করে
রামমোহন চেষ্টা করে, গেছে দেখ তায়।।
দীন দুদ্দুর বিনয় বচন
ধর্মনামের শয়তানের করণ
সৃষ্টি করে বিটলে বামন, লালন সাঁই কয়।।[৫]

বাউল মতবাদে বিশ্বাসী দুদ্দু শাহ্‌র দর্শনগত দিকের নানা বিষয়ে মতদ্বৈততা থাকলেও পুরুষ-প্রকৃতি সম্পর্কিত একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে তিনি অনড় ছিলেন। এই অনড়তার একটি বিশেষ কারণ হতে পারে মাতৃতান্ত্রিকতা। সমাজে মাতৃরূপী নারীর সতীত্ব নির্মাণ-রক্ষা-প্রমাণ এবং অবশেষে 'সতীদাহ' বা সহমরণের মাধ্যমে তার জীবনের করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নির্মিত ধর্মাশ্রয়ী নিয়মের কারণে। যাঁরা সমাজ সচেতন ও বিবেকবোধ সম্পন্ন মানুষ তাঁরা এসব নিয়মকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসাবে গণ্য করেন। সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় 'সতীদাহ' প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন ও

সফলতা পান। অন্দোলন সংগ্রামে সহযাত্রী হিসাবে পেয়েছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত আধুনিক মতবাদে বিশ্বাসী ও লেখাপড়া জানা লোকজন, মানবতাবোধে সচেতন লোকসমাজ। অতঃপর লর্ড বেন্টিংক ১৮২৯ সালে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বাউল কবি দুদ্দু শাহ্‌র 'সতীদাহ' সম্পর্কিত আবেগ-ধারণা-বর্ণনা আমাদের নিশ্চিত করে যে তিনি সে সময়ের সমাজস্থ উদার সংস্কারপন্থী ব্যক্তি। অর্থাৎ 'তিনি ঊনিশ শতকের মধ্যবর্তী পর্যায়ের মানুষ।'[৬] তাঁর 'জন্ম ১৮৪১ সালে এবং মৃত্যু ১৯১১ সালে।'[৭] গবেষকগণ বাউল কবি দুদ্দু শাহ্‌র পিতৃকুলের পরিচয়, জন্মস্থান, জন্ম-মৃত্যু কাল, লেখাপড়া প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করতে পারলেও স্ত্রী-সন্তানাদি, সাধন-সঙ্গিনী কিংবা যৌনজীবন বিষয়ে কোন তথ্য উপস্থাপন করতে পারেননি। তবে অনুল্লিখিত সূত্র মতে জানা যায় কবি শেষ জীবনে অন্ধত্ব বরণ করেছিলেন।

শিশু দুদ্দু শাহ্ শৈশবে পাঠশালায় গিয়েছিলেন শিক্ষা নিতে যা তাঁকে আধুনিক শিক্ষায় যতটা ভাবগ্রস্ত করে তোলে তার চেয়ে বেশি সমাজ বাস্তবানুগ করে তোলে। পরবর্তীতে তাঁর রচিত গানে আমরা যে রূপক, প্রতীক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও যমকের ব্যবহার দেখেছি তাতে বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে প্রারম্ভিক শিক্ষার গভীরতা আত্মস্থ করতে ও তা প্রয়োগে তিনি কোন সমস্যাই বোধ করেননি। পাঠশালায় মাতৃভাষা বাংলার পাশাপাশি ফারসি, সংস্কৃত ও আরবি ভাষা আয়ত্ত করেন। এরপর নিজেকে ইসলামি ধর্মগ্রন্থ কোরআনের হাফেজ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। কণ্ঠস্থ ও মুখস্থ ধর্মগ্রন্থ তাঁর আত্মিক বিনির্মাণে সাহায্য করে। ধর্মীয় ব্যাখ্যার পাশাপাশি এর সামাজিক প্রতিরূপ-প্রয়োগ, সমাজবাস্তবতা ও সমাজভেদে সমস্যাগুলি আত্মস্থ করেন। ধর্মভিত্তিক মান্য ও নিষিদ্ধকরণের তালিকা জানা ছিল বলেই তাঁর গানে উপস্থাপিত তথ্যভিত্তিক যুক্তিগুলি ছিল তরবারির ফলার মতো ধারালো।

ধর্মগ্রন্থ কোরআনের হাফেজ দুদ্দু শাহ্ যখন তাঁর তীক্ষ্ণধী দ্বারা গানের বিচার বিশ্লেষণ করছেন তখন বাউল শিরোমণি লালনের গান ও দর্শনে আচ্ছন্ন হয়েছিল বাংলার লোকসমাজ। কট্টর শরীয়তপন্থী ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ লালনকে ধর্মের শত্রু ঘোষণা করলেও সুফি মতবাদে বিশ্বাসী মরমীয়া সাধকগণ সাধনালব্ধ অভীষ্টের ঐক্য অনুভব করেন বাউল মতবাদের সঙ্গে। মরমীয়া সাধনার মতবাদগত এই ঐক্যই দুদ্দু শাহকে টেনে নিয়ে যায় লালন আখড়া ছেঁউড়িয়ায়। তিনি লালন আখড়ায় গান শুনে অন্যদের মতো ফিরে আসতে পারেননি কারণ তাঁর আত্মিক বোধ ততদিনে প্রায় স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল লালনের সঙ্গে। আত্মস্থ ও কণ্ঠস্থ করার অভাবনীয় দক্ষতার কারণে অল্প সময়েই লালনের গানের ভাণ্ডার হয়ে উঠলেন তিনি। শুধু গান নয়, গানের ভাবাত্মক ও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ করতেন অকাট্য যুক্তির সাহায্যে, ফলে লালন প্রিয় শিষ্যকে চিনতে ভুল করেননি। লালন স্বীয় মতবাদের সমস্ত গূঢ় তত্ত্ব, আচার-আচরণ ও দর্শন দুদ্দু শাহ্‌কে ভালোভাবে শিক্ষা দান করেন। অধিকন্তু তিনি ঐসব জ্ঞানের কথা-আদর্শের কথা তাঁকে ব্যাখ্যা ও প্রচার করার দায়িত্বও অর্পণ করেন।[৮] লালনের গানের ব্যাখ্যার পাশাপাশি গুরুর উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে

তিনি নিজে গান রচনা শুরু করলেন। গুরুভক্ত এই লালন শিষ্য নিজে গান রচনা করলেও বিনয়ের সঙ্গে অনেক গানে গুরুর নাম উল্লেখ করেন।

চাঁদের রূপের কাহিনী
শুনে লালন সাঁইজীর বাণী
দীন দুদ্দু বলে আমি শুনি, সে এক ফাঁকা ॥[৯]

এছাড়াও—

যাক্ বয়ে তাহাই করি
এই যদি গণ্য করি
দীন দুদ্দু কয় ফুকারি লালন সাঁইয়ের বচন।।[১০]

সাধন গুরু লালনের সাক্ষাত শিষ্য বাউল কবি দুদ্দু শাহ্ গুরুর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাউল দর্শনের পাশাপাশি সামাজিক দমন-পীড়ন-অত্যাচার-নির্যাতন, সামাজিক সমস্যা ও সমাধানের নানা উপায় নিয়ে গান লিখতে থাকেন। ধীরে ধীরে দার্শনিক জ্ঞানে পরিপক্কতা লাভকারী এই বাউল কবি গানে গানে মানুষের কথা যেমন বলেছেন তেমনি দর্শনগত বিশ্লেষণও করেছেন। ফলে তাঁর গান সমকালে মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল আর ভাবীকালের সামাজিক ইতিহাস, নৃতাত্ত্বিক উপাদান, দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণ, যুক্তির বন্ধন, ধর্মবোধ ইত্যাদি গবেষণার আকর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

তিন

সমাজে বসবাসরত প্রতিটি ব্যক্তির সমন্বয়ে সমাজ গঠিত হয়। মানুষ সামাজিক জীব বলে সমাজ ছাড়া মানুষের পক্ষে জীবনধারণ করা কঠিন। তাই সামাজিক ইতিহাসের আঙ্গিক বিবেচনার ক্ষেত্রে মানুষ ও সমাজ উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক ইতিহাসে সমাজ জীবনের কর্মকাণ্ডকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। কারণ সামাজিক ছোট ছোট ঘটনার সাহায্যে মানুষের সমাজজীবনের ইতিহাস জানা সম্ভব। সামাজিক ইতিহাস হচ্ছে তাই যা রাষ্ট্রের দণ্ড মুণ্ডের কর্তা ব্যতীত সাধারণ মানুষের সহজ সরল সাধারণ স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি, যার সাহায্যে তারা অতীত অভিজ্ঞতাগুলিকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতের ভিত রচনা করে জীবন পরিচালিত করে। কোনো সামাজিক ইতিহাস জানতে হলে তার সমকালীন সাহিত্য জানা চাই। জানার এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই আমরা দুদ্দু শাহ্‌র দ্বারস্থ হই।

অজ্ঞ মানুষ জাতি বানিয়ে
আজন্ম ঘুরিয়া মরে স্বজাতি খুঁজিয়ে ॥
শিয়াল কুকুর পশু যারা
এক জাতি এক গোত্র তারা
মানুষ শুধু জাতির ভারা মরে বইয়ে ॥[১১]

মানুষ নিজেদের মধ্যে জাত প্রথা বানিয়ে বিভাজন সৃষ্টি করেছে। ইসলাম ধর্মগ্রন্থ অনুসারে মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বলা হলেও বিবেক-বিচার-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে নিজেদের খুব বেশি উন্নতি করতে তারা সমর্থ হয়নি। অথচ মনুষ্যতর প্রাণিকুলের মধ্যে জাত্যন্তরের মতো ঘৃণিত বিষয় কাজ করে না। তাই দুদ্দু শাহ্‌র আক্ষেপ, মানুষ শুধু জাত প্রথা বিনির্মাণই করেনি তা আজও বয়ে চলেছে যা সমাজের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

অছুঁৎ ছুঁৎ বলি সদায়
ছুঁইলে জাতি নাকি যায়।[১২]

সমাজে বসবাসরত মানুষের কর্ম ভিত্তিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার ধরনের জাতের সূত্রপাত করা হয়। শূদ্র শ্রেণীর মানুষের কাজ অন্যান্য শ্রেণীর সেবা করা। অন্য শ্রেণীর লোকজন শূদ্রদের অধঃস্তন মনে করলেও তাদের সেবা গ্রহণে দ্বিধা করে না কিন্তু তাদের স্পর্শে জাত্যন্তর হওয়ার মতো বিড়ম্বনাকে সত্য বলে মনে করে।

নমশূদ্র, মুচি, বাগদী
তারাও খোঁজে জাতির সিদ্ধি।[১৩]

সমাজে যারা অধঃস্তন জাতি গোষ্ঠীর মানুষ বলে পরিগণিত তারাও মানুষ, তাদেরও অধিকার আছে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার। মানবিক যে কোন অধিকার হতে তাদের বঞ্চিত করা উচিত নয়। সারা জীবন অধিকার বঞ্চিত থাকার কারণে তারা যাদের সেবা করে তাদের স্থলে নিজেদের দেখতে চায়। অর্থাৎ আপন অবস্থান বদলে সুখের সন্ধান চায়।

বামনের আর কিসের গর্ব ভাই
রামকৃষ্ণ বলে যারে তারাতো ক্ষত্রিয় সবাই ॥[১৪]

কর্মভিত্তিক যে জাত বিভাজন সৃষ্টি করেছিল আমাদের পূর্ব পুরুষেরা তাতে ব্রাহ্মণের কাজ ছিল ধর্ম রক্ষা করা। ব্রাহ্মণ নিজে ধর্ম পালন করত এবং অন্যদের ধর্ম রক্ষা করত। রাজা রামচন্দ্র ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ধর্ম পালনের নিমিত্তে স্মরণ করা হয় কারণ তারা ধর্মাবতার। তাদের কর্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তারা সকলেই ছিলেন যোদ্ধা প্রকৃতির অর্থাৎ ক্ষত্রিয়। জাতিভিত্তিক স্তরানুসারে ব্রাহ্মণের পরই ক্ষত্রিয়ের অবস্থান। অথচ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে পূজার্চনা করছে যা সমাজে অগ্রহণযোগ্য।

অতীতকালে যারা জাতি সৃষ্টি করেছে
জানতো না তারা এ'জগতে কোন্ দেশে কোন্ জাতি আছে ॥
ছিল না এত বুদ্ধি জ্ঞান
পরস্পরের জানাজানির ছিল না বিধান
কালে এ সকল প্রমাণ মানুষ জানতে পেরেছে ॥[১৫]

দুদ্দু শাহ্ জাত বিভাজন সৃষ্টিকারীদের সীমিত জ্ঞানের কথা বলেছেন। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যোগাযোগের অভাবকে ইঙ্গিত করেছেন জাত বিভাজনের সম্ভাব্য কারণ

হিসেবে। কিন্তু বর্তমান সমাজের মানুষ এসব প্রতিকূলতার উর্ধ্বে বলে তিনি মনে করেন। তাই এখন আর জাত প্রথা মানা উচিত নয় বলে কবির অভিমত।

জাতাজাতি সৃষ্টি করে ভারতকে শ্মশান দিলে
যত সব কায়েত বামন অবশেষে এই বুঝিলে ॥
শূদ্র, বৌদ্ধ, ইতর, মুসলমান
সবি তো এক মায়ের সন্তান
ভারতের মাটিতে সবারই প্রাণ, কেউ না দেখিলে ॥[১৬]

জাত-পাত প্রথা সৃষ্টির মাধ্যমে মানবতার শ্মশান নির্মিত হয়েছে বলে কবির ধারণা। মানবতাবাদী কবির হৃদয়ের অন্তঃস্তল শ্মশানে প্রজ্জ্বলিত কুল কাঠের চিতার আগুনে ক্ষতবিক্ষত। তিনি সকল ধর্মাবলম্বীকে একই মাতার সন্তান বলে ঘোষণা করেছেন। বাচনিক বিশ্লেষণের নিরিখে কবির এই উক্তিকে মানব মাতার পাশাপাশি দেশ মাতৃকা হিসেবেও আমরা ভাবতে পারি। কবির এই রচনার কাল নিঃসন্দেহে উনিশ শতক এবং ভিত্তিভূমি অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ভূগোল। জাত বিভাজনের এই প্রথা তৎকালীন ভারতীয় সমাজে যে দানবীয় আকার ধারণ করেছিল তা কবির সহজাত উচ্চারণ হতে বোঝা যায়।

এল রে কলির ধূয়া এই দেশে
রাত্র দিন গাই রে তাই বসে ॥
মা-বাপকে ভাত দেয় না ছেলে
বিবিটারে পেলে
খ্রীস্টানী চলন চালে, দেশ গেল ভেসে ॥[১৭]

বাউল দুদ্দু শাহ্‌ সামাজিক বিশৃঙ্খলার ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে আদর যত্নে বড় করে তোলেন। এক সময় স্বনির্ভর হয়ে ওঠে শিশু, নিজের সংসার তৈরি করে। বাবা-মা বৃদ্ধ হলে তারা সন্তানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন সন্তানের নৈতিক দায়িত্ব হয় তার বাবা-মার দেখাশোনা করা। কিন্তু অনেক সন্তানই নৈতিকতার বোধে নিজেকে উত্তীর্ণ করতে পারে না। প্রাচ্যের সমাজব্যবস্থায় পরিণত সন্তানের উপর বৃদ্ধ পিতা-মাতা নির্ভরশীল। কিন্তু পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থায় সন্তান স্বনির্ভরতা লাভ করলে আর পিতা-মাতার সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না। পাশ্চাত্যের এই সামাজিক সংস্কৃতিকে দুদ্দু শাহ্‌ খ্রিস্টানি চলন বলে অভিহিত করেছেন। এবং এই সংস্কৃতির মাধ্যমে স্ত্রী ও নবগঠিত একক পরিবারের প্রচলন আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির উপর বড় ধরনের আঘাত হতে পারে বলে কবি মনে করেন।

পরাধীন এই ভারতবাসী
ঘর ছেড়ে বাস করে কাশী।[১৮]

কবি ভারতীয় সাধারণ জনগণকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বের হয়ে না আসতে পারায় তিরস্কার করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণ প্রায় দুই'শ বছর প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ও পরে সরাসরি ইংল্যাণ্ডের শাসনাধীন ছিল। ধর্মভীরু উপমহাদেশীয় জনগণ নিজেকে স্বাধীন করার চেয়ে কাশীতে তীর্থ ভ্রমণ করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করত। ধর্ম পালনের চেয়ে নিজ মাতৃভূমিকে স্বাধীন করা কবির কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে কবি সকল জনগণকে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

এ দেশের মুসলমানে বড়াই করে
আমরা বাদশাই জাতির খান্দানরে ॥
সহস্র বৎসর পুর্বে ভাই
মুসলমানের গন্ধ দেখি নাই
যত অনার্য শূদ্র ওরাই, ধর্ম ভারত হয় রে ॥
তারাই ছৈয়দ খোনকার
বলিয়া করলায় এবার
দুঃখে মরি রে 'বারবার' দশা এদের হেরি রে ॥
করে চৌকিদারী পেয়াদাগিরী
দ্বারে দ্বারে ফেরে ঘুরি
দুদ্দু তাইতো কয় ফুকারি, বড়াই ভাল নহে রে ॥[১৯]

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের ইতিহাস খুব বেশি দিন আগের নয়। সপ্তম-অষ্টম শতকে কিছু সংখ্যক ইসলাম ধর্ম প্রচারক সুফি ব্যক্তির এদেশে আগমন ঘটলেও ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমেই প্রকৃত ইসলাম প্রচার শুরু হয়। সেই হিসাবে এদেশে ইসলামের বয়স এক হাজার বছরেরও কম। জাতি-বর্ণ ভেদের বিচারে শূদ্র শ্রেণীর লোকেরা ছিল অন্যদের দ্বারা নির্যাতিত। এই নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নিচু শ্রেণীর শুদ্ররা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের পর থেকে ১৭৫৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত যাওয়া পর্যন্ত ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই দেশের শাসনভার পরিচালনা করেছে বলে তাদের মধ্যে অহংকারের সৃষ্টি হয়েছে— এমন অভিমত কবির। তারা ভুলে যায় যে, আজ নিজেদের উচ্চবংশীয় দাবী করলেও এক সময় উচ্চ অবস্থানের লোকেদের সেবা করেই তাদের দিন কাটত। ঐ সেবাই ছিল তাদের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের উৎস। অহংকারীর পরিণতি ভাল নয় বলে কবি সকলকে সতর্ক করেছেন।

এদেশে জাত বাখানো সৈয়দ কাজী দেখি রে ভাই
যেমন বঙ্গ দেশের ব্রাহ্মণ সবাই ॥
ব্রাহ্মণের দেখাদেখি
কাজী খোনকার পদবী রাখি

শরীফি করলায় ফাঁকি দিয়ে সর্বদাই ॥
জোলা কুলু বা জনদার যারা
ইতর জাতি বানায় তারা
এই কি ইসলামের শরা, করিস তারই বড়াই ॥[২০]

পবিত্র ধর্মগ্রন্থের আলোকে ইসলাম ধর্ম পালনকারী সমাজে কোন রকম জাতি-বর্ণের ভেদাভেদ নাই। কিন্তু এক সময়ের শূদ্র যে কিনা ব্রাহ্মণের সেবা করেই দিন কাটাতো সেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর বড় পদবীর নেশায় ছুটে চলেছে। এই নেশা তার মানসিক অবদমন থেকে তৈরি হয়েছে। অনেক দিন ধরে নির্যাতিত হওয়ার কারণেই এমন মানসিক অবস্থা। এমনকি তারা নিজেদের উচ্চ অবস্থানে বসিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, সেবাধর্মী বৃত্তির লোকেদের নিম্নশ্রেণীর বলেও আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। অথচ ইসলাম এসবের বিরুদ্ধে। তাই কবি ইসলামী নিয়ম মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন।

শূদ্র, চাঁড়াল, বাগদী বলার দিন
দিনে দিনে হয়ে যাবে ক্ষীণ
কালের খাতায় হইবে বিলীন দেখছি রে তাই ॥[২১]

অমানবিক জাতি-ধর্ম প্রথা একসময় অবশ্যই বিলীন হবে বলে কবি বিশ্বাস করেন। কারণ এই প্রথা নির্মাণের মাধ্যমেই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ যখন সভ্যতার সিঁড়িগুলিতে মানবতার পথ অতিক্রম করবে তখন অবশ্যই এসব অমানবিকতার ক্ষতচিহ্নগুলি মুছে ফেলার চেষ্টা করবে বলে কবির বিশ্বাস।

ধলা কালার একই বীজ ভাই
সর্ব জাতি যাতে হয় উদয়
কর্মগুণে এই সমাজে, ভিন্ন গোত্র আখ্যা পাই ॥[২২]

পিতার বীর্য মাতার গর্ভে প্রতিস্থাপিত হলে সন্তান জন্ম লাভের পর্যায়গুলি শুরু হয়। সকল মানব সন্তান জন্ম লাভের প্রক্রিয়া একই। কিন্তু সমাজে সবাই একই কাজ করে না বা সকলে একই কাজে পারদর্শী হয় না। তাই আপন কর্মের মাধ্যমেই মানুষের পরিচয় নিহিত। জন্ম যাই হোক, কর্মই মানুষের সকল পরিচয়ের ভিত্তি। কারণ কর্মের মাধ্যমেই মানুষের পরিচিতি ও টিকে থাকা।

সেদিন উৎরিয়া গেলে 'গাজীর গান' বেড়াও শুনি।[২৩]

'গাজী দক্ষিণ বাংলার অন্যতম লৌকিক দেবতা। ইনি দক্ষিণ রায়, বনবিবি প্রভৃতির মত বন অঞ্চলের ব্যাঘ্রকুলের অধিষ্ঠাতা বলেই প্রসিদ্ধ। এঁকে 'জিন্দাপীর' বা 'গাজীসাহেব' বলেও অভিহিত করা হয়।'[২৪] বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে গাজীর গানের প্রচলন বেশি। আগের দিনের চেয়ে সারা দেশে এর প্রচলন কিছুটা কমেছে বলে মনে হয় তবে সুন্দরবন অঞ্চলের জনমণ্ডলে এখনও গাজী পীরের প্রভাব অনবদ্য। 'গাজীর গান ব্যাপকতার দিক থেকে গ্রাম-

বাঙলার সমাজ-জীবনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করত। বিশেষ করে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে গাজীর গানের আকর্ষণ ও প্রচলন ছিল খুবই ব্যাপক।'[২৫] বর্তমান সময়েও গাজীর গানের এমন অনেক সংগঠিত দল আছে যারা পালাগুলি অভিনয় করে দেখায়। গাজী পীরের নামে শিরনি দিলে বা গাজীর গান মানত করলে অমঙ্গল দূরীভূত হয়, ক্ষতির আশংকা তিরোহিত হয় প্রভৃতি বিশ্বাস লোকসমাজে প্রচলিত আছে। কবি লোকসমাজের বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি মানবসমাজে সৃষ্ট যে কোন বিপর্যয় থেকে উত্তরণের পর মানত করে গাজীর গান শোনার পরামর্শ দিয়েছেন।

বল্লাল সেন শয়তানী দাগায়
গোত্র জাত সৃষ্টি করে যায়
বেদান্তে আছে কোথায়, আমরা দেখি নাই ॥[২৬]

সেন শাসক বল্লাল সেন বেদ অবলম্বনে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে গোত্র বিভাজন সৃষ্টি করেছিলেন— গবেষকগণ এমন মত প্রকাশ করেছেন। সমাজের জন্য ক্ষতিকর প্রথা চালু করায় বল্লাল সেনকে খারাপ মানসিকতার মানুষ বলে কবি অভিহিত করেছেন। মধ্যযুগীয় অমানবিক জাত প্রথাকে অস্বীকার করেন বলে তিনি এর উৎসের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন এবং এই জাতি-ধর্ম নির্মাণের কারণকে অযৌক্তিক বলে দাবী করেছেন।

সতীদাহ বলে যারে
তা কি মনুষ্যে করে
রামমোহন চেষ্টা করে, গেছে দেখ তায় ॥[২৭]

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একসময় সহমরণ প্রথা চালু ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর সদ্য বিধবা স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিত। আত্মাহুতি দিতে অস্বীকৃতি জানালে সমাজ তাকে অসতী মনে করত এবং সমাজে তাকে একঘরে করে রাখা হত। আবার অনেক সময় অস্বীকৃতি জানানো স্ত্রীকে তার পরিবারের লোকজন সমাজ নিয়ন্ত্রিত রক্তচক্ষুর ভয়ে সহমরণে যেতে বাধ্য করত। জোর করে হত্যা বা হত্যার চেষ্টা কিংবা আত্মহত্যা সবই মানবতার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ বলে পরিগণিত। আধুনিক সভ্য সমাজে এমন বর্বরতা কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্রযন্ত্র মানবতার রক্ষক হওয়ায় এমন অপরাধ সমাজে গর্হিত কাজ বলে স্বীকৃতি পায়। সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় অমানবিক সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে নিজে অবস্থান নেন এবং প্রবল সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হন। পরে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা বিলোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমাজসংস্কার বিষয়ক কোন কিছুই কবির নজর এড়ায়নি।

শুধু রে ভাই জাতাজাতির দোষে
ফিরিঙ্গীরা রাজা হলো এদেশে এসে ॥
হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান
পরস্পরে হিংসায় দিল প্রাণ

তাইতে পাদ্রী খৃষ্টান, যীশুখৃষ্টের দীন প্রকাশে ॥
কোটি কোটি ভারতবাসী এক হয়ে রইলো না মিশি
কয়জন ফিরিঙ্গি আসি,এদেশ জুড়ে বসে ॥[২৮]

১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত বর্ষের শাসনভার গ্রহণের আগেই ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ইংরেজ খ্রিস্টান মিশনারিগণ খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করেন। তারা এদেশের জনসাধারণের মানসিকতার খুব কাছাকাছি নিজের অবস্থান তৈরি করে ধর্ম প্রচারে সফলতা লাভ করতে শুরু করে। পাদ্রিরা যখন ধর্ম প্রচারে সফলতা লাভ করতে শুরু করে তখন এক শ্রেণীর ইংরেজ বণিক এদেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে আগমন করে। পরে তারা শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এদেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং প্রহসনের যুদ্ধে জয়লাভ করে ক্ষমতা দখল করে নেয়। কবি কোটি কোটি ভারতবাসীর পরাধীনতাকে সাগ্রহে বরণ করে নেয়ার মানসিকতার প্রতি নিন্দা জানিয়েছেন, তিরস্কার করেছেন।

চার

প্রাচীন প্রথা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা মানুষের সমাজ ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। সমাজের নানা বিষয় সাহিত্যের উপাদানগুলিতে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। দুদ্দু শাহ্ রচিত সাহিত্যকর্ম এর ব্যতিক্রম নয়।

দীনের নবী কর্ম করে
সে নবীর উম্মত হয়ে রে, তাবিজ বেচো জেনে শুনে ॥
অকর্মা অলস যারা
তাবিজ বেচে খায় রে তারা
ব্রাহ্মণেরা যেমন ধারা, মিথ্যা কর্ম করে পয়সা গুনে ॥[২৯]

ইসলাম ধর্মের শেষ নবীকে উল্লেখ করে দুদ্দু শাহ্ নিষ্কর্মা মানুষের প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করেছেন। গ্রামের সাধারণ জনগণকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর পেশাজীবী আছে যারা ধর্মের নামে তুক-তাক, তাবিজ-কবচের কথা বলে। তারা তাবিজের মাধ্যমে রোগ সারানোর কথাও বলে। কিন্তু আসলে রোগ থেকে মুক্তির জন্য চাই ওষুধ। গ্রামের কবিরাজ শ্রেণীর মানুষ ঝাড়-ফুঁক, তুক-তাক এর সাহায্যে চিকিৎসার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ আবার এর সাথে গাছ-গাছড়ার কিছু ছাল-বাকলও কাজে লাগান। আমরা সভ্যতার ইতিহাস থেকে জানতে পারি আজকের ঔষধ বিজ্ঞান আসলে প্রাচীন কাল হতে আজ পর্যন্ত নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল। এমন অনেক ভেষজ ঔষধ আছে যা সেবনের মাধ্যমে বর্তমানের চিকিৎসা বিজ্ঞানের তুলনায় দ্রুত আরোগ্য লাভ করা সম্ভব। আসলে এসবই চিকিৎসা নৃ-বিজ্ঞানের পাঠ্য। কিন্তু কবি এখানে ধর্ম রক্ষাকারী ব্রাহ্মণের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কবিরাজের তাবিজ বিক্রির তুলনা করেছেন।

মানবশিশুর জন্মলাভ থেকে বেড়ে ওঠার পর্যায়গুলিতে মা-ই তার সর্ব আশ্রয়স্থল। মাতৃগর্ভে থেকে শিশু যেমন পরিপুষ্টি লাভ করে তেমন সান্নিধ্য লাভে মানসিক বিকাশের পূর্ণতা পায়। একই ভাবে মাতৃরূপী কর্ষিত ভূমি মানবসন্তানের খাবারের আধার। খাদ্য বিনা মানবজীবন যেমন অসাধ্য তেমন মাতৃ বিনা জীবন অপূর্ণ।

মেয়ের চরণ নে রে মাথায় করে
মেয়ে বিনে এ ভুবনে গতি নাই রে ॥
ত্যাজে নারী বনবাসী
হলি রে মর্কট সন্ন্যাসী
তার চরণে গয়াকাশী, দেখলিনে রে ॥[৩০]

উপর্যুক্ত পংক্তিগুলিতে মেয়ে অর্থে কবি নারী জাতির উল্লেখ করেছেন। মাতৃগর্ভে বেড়ে ওঠার পর সন্তান পৃথিবীর আলো দেখে তারপর শিশুর সকল রকম সেবা শুশ্রূষা করেন মা। মাতৃ যত্নে সন্তান আস্তে আস্তে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। যৌবনে আবার একজন মেয়েকেই জায়ারূপে গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ পুরুষ মানুষকে জীবনের অনেকটা সময় নারী সংসর্গে কাটাতে হয় যা অস্বীকার করা যায় না। মাতৃ, জায়া ও কন্যা এই তিন রূপেই নারী পূজনীয়, শ্রদ্ধার, ভালবাসার ও স্নেহের। সাধনার ধারাতেও নারী বিনা সিদ্ধি লাভ অসম্ভব বলে সিদ্ধ পুরুষগণের অভিমত। নারীর চরণ গয়া কাশীর মতো তীর্থস্থানের সমতুল্য বলে এর গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছেন কবি।

সাধন করো রে মন
ধরে মেয়ের চরণ ॥
যারে ধরে ভবে এলি
তারে আজ কোথায় হারালি।
ফিরিবি অলিগলি
ভুলিয়া এখন ॥
পিতা শুধু বীর্যদাতা
পালন ধারণ কর্ত্রী মাতা।
সে বিনে মিছে কথা
ভজন সাধন ॥
আগে মেয়ে রাজী হবে
ভজনের রাহা পাবে।[৩১]

আপন জঠরে সন্তান ধারণ থেকে শুরু করে শিশুর শারীরিক দেখভালের দায়িত্বের অধিকাংশই পালন করেন মা। মায়ের প্রতি উদাসীনতা ও অবহেলা কোনভাবেই কাম্য নয়। মাতৃসেবায় অবহেলার কারণে দণ্ডিত কোন ব্যক্তি সাধনার উচ্চ মার্গে পৌঁছালেও তার সে

সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে বলে কবির ধারণা। তাই কবি সর্ব প্রথমে মাতৃভজনার কথা বলেছেন।

নারী ভজনের গোড়া তন্ত্রের নিরাপণ
যুবতী দর্শন মাঝে।
কালিকা দর্শনং ভবেৎ
শিবের বচন ॥[৩২]

মাতৃকা উপাসনার ধারায় দেবী কালীর অবস্থান অনেক উপরে। শুধু সমাজদর্শন বা ধর্ম ভিত্তিক কথাতেই যে মাতৃ ভজনার কথা বলা হয়েছে তা নয় তান্ত্রিক সাধনার ধারাতেও নারী সাধনার কথা উল্লিখিত। দেবতা শিবের দোহাই দিয়ে কবি একথা জানিয়েছেন।

কুলবতী সতী যুবতী রসবতী
সুশীলা সুমতি, ষড় লক্ষণ ভাবের গতি নায়িকা যে জন
তাহার মাঝারে— নায়ক ডুবে যাবে ভবসিন্ধু হয়ে যাবে পার,
আছে পাত্র নিরাপণ ॥[৩৩]

বংশ সম্মান রক্ষাকারী, সৎ চরিত্রের অধিকারী, যৌবনবতী, জীবন রস সম্পর্কে জ্ঞাত, শালীনতা বোধের অধিকারী, ভাল মনোভাব-এই ছয়টি গুণ যে নারীর মধ্যে থাকবে তার সাহায্য নিয়ে সাধনায় সিদ্ধি লাভ সম্ভব। সিন্ধু নদের ন্যায় দীর্ঘ সাধনার পথও পুরুষ অতিক্রম করতে পারবে উপর্যুক্ত গুণ সমৃদ্ধ নায়িকার সান্নিধ্যে।

পাঁচ

দর্শনকে অবলম্বন করে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যৌক্তিক বিচারের যে ধারা প্রচলিত তার আলোকে দুদ্দু শাহ্‌র গানগুলির বিচার বিশ্লেষণ করলে আমরা তাঁর যুক্তিবাদী চিন্তালোকের উজ্জ্বল আভায় উদ্ভাসিত হই।

কোন্ দেশে কাহার বাস
কোথা ধর্ম কোথায় প্রকাশ
একালে জেনে এসব, মানুষ জাতি জ্ঞান বুদ্ধি পায় ॥
বেদ বাইবেল কোরান ত্রিপিটক
গ্রন্থ সাহেব কনফুসির মত।[৩৪]

সাগরের মধ্যভাগ থেকে যেমন চারপাশে ঢেউ আছড়ে পড়ে তেমনি যে কোন ধর্ম বা ধর্মমত প্রকাশিত হলে তা চারপাশে প্রচারিত হতে থাকে। সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় স্থান থেকে বিভিন্ন বাধা বিপত্তি এড়িয়ে ধর্মানুরাগী ও ধর্মানুসারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। আচার-সংস্কৃতি ভিন্ন হলেও ধর্মবিশ্বাসের ঐক্য মানুষকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। প্রতিটি ধর্মের আলাদা আলাদা ধর্মগ্রন্থ রয়েছে যেগুলির সাহায্যে মানুষকে সমাজ নির্ধারিত বিপথ হতে দূরে থাকতে

পরামর্শ দেয়া হয়। এসব ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন বিষয়কে সামনে রেখে মানব কল্যাণের কথা বলেছে। বাউল কবি দুদ্দু শাহ্ বাংলাদেশের মানুষ হয়েও খোঁজ রেখেছেন সমসাময়িক বিশ্বে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মমত ও দর্শনের।

যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল
বস্তুতে ঈশ্বর খুঁজে পায় তার উল ॥
পূর্ব পূনঃ জন্ম না মানে
চক্ষু না দেয় অনুমানে
মানুষ ভজে বর্তমানে, হয় রে কবুল ॥[৩৫]

এই গানের মাধ্যমে বাউল কবি দুদ্দু শাহ্র বস্তুবাদী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুবাদী চেতনায় উদ্ভাসিত মানুষ কোন অনুমান বা কল্পনায় বিশ্বাস করেন না। তিনি যা দেখেন ও বোঝেন তাতেই বিশ্বাস স্থাপন করেন। মানবতাবাদী এই কবি পৃথিবীতে আর কিছুই দেখেন না বলে মানুষকে তিনি পরম বস্তু হিসাবে কল্পনা করেছেন এবং এতে পরমাত্মা ঈশ্বরের সন্ধান মিলবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

রামকৃষ্ণ হরি নারায়ণ
রজঃ বীর্যে সবার সৃজন
স্বভাব মত সবার স্মরণ, শাস্ত্রে লেখা কয়॥
তার উপরে আছে যে জন
করে গোরা তাহার সাধন।[৩৬]

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কিংবা অন্যান্য দেবতা সকলেই মানুষের সৃজন বলে মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়াতেই তারা নির্মিত হয়েছেন এমনটা কবির মত। কবি প্রকৃতি ও পুরুষ সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বরের অবদান স্বীকার করে তার সাধনা করার কথা বলেছেন। তাই কবির দর্শন ঈশ্বর সাধনার পক্ষে। তার এই যুক্তির পক্ষে শ্রীচৈতন্য দেবের অবস্থান বলে কবির অভিমত প্রকাশিত।

কি ধর্ম প্রচারে গোরা যারে প্রেমের ধর্ম কয়
তবে কেন হরিদাসে 'হরিণাম' নিতে হয় ॥
সর্ব ধর্মে আছে মুক্তি
বৈষ্ণবেরা বলে যুক্তি
তবে কেন এ রীতি হরিদাসের বেলায় ॥[৩৭]

মানবতাকামী মানুষেরা মানবীয় প্রেমের মাধ্যমে জাগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে নিজেকে পরম সত্তার সঙ্গে মিলিত করতে পারেন। জগতে যেকোন পাপ কাজের ফলে পুণ্যলাভ থেকে বিচ্যুত হলে মানব সেবার মাধ্যমেই উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন যে, মানুষকে ভালবাসার মাধ্যমেই মানবাত্মার বিকাশ। সূক্ষ্ম দার্শনিক যুক্তির মাধ্যমে হরিদাসদের কথা বলেছেন কবি। কারণ, হরিদাসরা সব সময় মানুষের সেবায়

নিয়োজিত থাকে। তিনি চৈতন্যদেবকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, হরিদাসরা যেহেতু সবসময় মানুষের সেবা করে সেহেতু তাদের জপমালায় 'হরিণাম' উচ্চারিত না হলেও তো চলার কথা। অর্থাৎ মানব সেবার মাধ্যমেই যদি মোক্ষলাভ সম্ভব হয় তাহলে কিছু বিশেষ সম্প্রদায়ের আলাদাভাবে ঈশ্বরের সাধনা করার প্রয়োজন নাই।

সাবধানে খেলো গো ভাই সাপ খেলা
চৈতন্য গুণিন ধরে শিখে নাও এই বেলা ॥
কালো নাগ কাল কেউটে ধরে
যে সাপুড়ে খেলতে পারে
রসিক গুণিন বলি তারে; সেই তো ধন্বন্তরীর ঠ্যালা ॥
ভরা সাপ ভাদর মাসে
বেহুলার ঘাটে ভাসে
সেই সাপ খেলতে এসে, বুকে নিল সাপের জ্বালা ॥
চৈতন্য গুণিন যার ঘরে
ভরা সাপ সেই ধরতে পারে।[৩৮]

কবি রূপক প্রতীকের আশ্রয়ে কথা বলেছেন। সাপ হচ্ছে রিপু, রিপুর নিয়ন্ত্রণ সাপখেলা, ওঝা হল রসিক গুণিন। মানুষ রিপুর তাড়নায় খারাপ কাজে লিপ্ত হয়। এই রিপুকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন তিনিই ধন্বন্তরী হবেন। তবে ধন্বন্তরী হতে চাইলে প্রকৃত গুরুর সান্নিধ্য লাভ করা চাই। সিদ্ধিপ্রাপ্ত গুরুর মাধ্যমে গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষিত হলেই শুধু রিপুর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। কবি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক শ্রীচৈতন্য দেবকে রসিক গুণিন বলেছেন, কারণ তিনি নিজে যেমন শুদ্ধবাদী ছিলেন তেমন শুদ্ধতার প্রচার করেছেন। কবি অনিয়ন্ত্রিত রিপুর প্রসঙ্গে বাংলাদেশে প্রচলিত লোকপুরাণ 'বেহুলা'র উল্লেখ করেছেন। এই লোকপুরাণের কাহিনী সকলের জানা বলেই হয়তো কবি এটিকে উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। লোকপুরাণের নায়ক লখিন্দরের পিতা চাঁদ সওদাগর সর্পদেবী মনসার পূজা দিতে অস্বীকৃতি জানালে দেবী তাকে নির্বংশ হওয়ার অভিশাপ দেন। পূজা প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো চাঁদ সওদাগরের একগুঁয়েমি স্বভাবপুষ্ট ও দেবতা শিবের প্রতি একনিষ্ঠতার পরিচায়ক। স্বর্গলোকের দেবী ও মর্ত্যলোকের মানবের অসম লড়াই চাঁদ সওদাগরের রিপুর কারণে ঘটেছিল বলে কবি উদাহরণ হিসাবে তার উল্লেখ করেছেন।

ছয়

কার্য ও কারণের সম্পর্কসূত্র যুক্তির ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। যুক্তি মানুষকে করে তোলে মানবীয় গুণাবলী সম্পন্ন, নৈতিকতার বোধে সমুজ্জ্বল। বিবেকবান মানুষ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে অপরের উপকারে নিজেকে নিয়োজিত করেন, অপকার হতে নিবৃত্ত হন। এহেন মানুষের নিকট যুক্তি আর ধর্মের অবস্থান পাশাপাশি।

আগে মানুষ পরে ধর্ম জাতির নির্ণয়
ধর্মজাতি আগে হলে শিশু-বালক কে না জানতে পায় ॥
দর্শন শ্রবণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে
শেখে শিশু হিন্দু যবন আর খ্রীস্টানে
বিচার আচার হিংসা ঘৃণা উদয় হয় মনে, জন্মগত নয় ॥[৩৯]

মানুষের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক বিষয়ে কবি এখানে বলেছেন। যুক্তির মাধ্যমে তিনি উপস্থাপন করেছেন যে, মানবশিশু জন্মের সময় ধর্ম বিষয়ক কোন বিধিতে আবদ্ধ থাকে না কিন্তু সমাজ তাকে পরবর্তী সময়ে সে বিষয়ে শিক্ষা দেয়। কবি 'পরিবেশ প্রসঙ্গবাদ' তত্ত্বের মতো করে বলেছেন পরিবেশ মানুষকে যে কোন ধর্মের বিষয়ে আগ্রহী বা বিরাগী করে তোলে। এখানে পরিবেশের ভূমিকা অনেক বেশি এবং অবশ্যই পরিবেশের অন্যতম উপাদান মানুষ এর অন্যতম কারিগর। জন্মলাভের পর থেকে শিশু তার আশেপাশে যা কিছু দেখে ও শোনে তা থেকেই শিক্ষা নেয়। ক্রমেই সে তার ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানগত প্রখরতা লাভ করে এবং কট্টর ধর্মবাদীরা অন্য ধর্ম সম্পর্কে তার কানে বিষ ঢেলে দেয়। ফলে স্বধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মের লোকজনকে তার আলাদা চোখে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তেরি হয়। অর্থাৎ ধর্মবোধ মানুষের জন্মগত কোন বিষয় নয় বরং তা মানুষেরই তৈরি। বাউল কবি দুদ্দু শাহ্ অকাট্য যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করেছেন।

হজ্জ করিলে যদি যেতো গুনা
মক্কায় জন্মিয়া কেউ পাপী হতো না ॥
মক্কায় গেলে পাপ যাবে ভাই
একথার বলিহারি যাই
যুক্তি মতে বুঝাও তো এবার শরার বেনা ॥
ইব্রাহিমের মক্কা গঠন
তাতে যদি হয় পাপ বিমোচন
এমন কথা কে বলেছে কোন্ জনা ॥[৪০]

মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল পাঁচটি ভিত্তির একটি হল হজ্জ। ধর্মবিশ্বাস মতে, হজ্জ পালন করলে মানুষ যাবতীয় অপকর্মের দোষ হতে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। হজ্জ পালনের নিমিত্তে কেউ মক্কায় তীর্থ ভ্রমণ করলে তার পাপকাজের শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের আদি পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) সৃষ্টিকর্তার নিকট নিজেকে নিবেদনের লক্ষে নির্ধারিত আচার পালনের নিমিত্তে বর্তমান সৌদি আরবের মক্কায় কাবা শরীফ নির্মাণ করেন। একস্থানে পাপকাজ করে অন্য স্থানে তার প্রায়শ্চিত্ত করলে তা বাস্তবতা রহিত হয়ে যায় বলে কবির বিশ্বাস। কবি ধর্মবিশ্বাসের ঐশী দিক এবং জাগতিক বোধকে যুক্তির সাহায্যে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন।

ছাই চাপা থাকে না অগ্নি
আগুন বস্তু এমনি
মনুষ্যত্ব সত্য তেম্‌নি বের হয় স্ফুরে ॥
ফলে বৃক্ষের পরিচয়
এই কথা সকলে কয়
যে যা দেয় সেই তো পায়; এই সংসারে ॥[৪১]

কবি দুদ্দু শাহ্‌র বয়ানে প্রখর যুক্তিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজজীবনের সহজ সরল ও বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে কঠিন বিষয়কে তিনি তুলে ধরেছেন। মানবিক বোধ মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বীকৃত। মানবীয় গুণাবলী সম্পন্ন হওয়ার কারণে মানুষ পৃথিবীর অন্য সকল জীব থেকে আলাদা। ইসলাম ধর্ম মতে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সকল সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ মনুষ্যত্ব হল এমন মানবীয় গুণ যার সাহায্যে মানুষ নিজেকে পৃথিবীর অন্যান্য জীবকুল হতে আলাদা করতে পারে। উপর্যুক্ত গানে কবি মানবিকতার বোধকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রজ্জ্বলিত আগুনকে যেমন কোন রকমেই ছাইচাপা দিয়ে রাখা যায় না তেমনি মানবিকতাবোধের বিকাশকে দমিয়ে রাখা যায় না। কোন গাছে কেমন ফল হয় তা দ্বারা গাছের যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি মানুষেরও। লোককবি আরও বলছেন যে, পৃথিবীতে যে যেমন কর্ম করে সে তেমন ফল পায়। এবং এসব কথা তিনি সমাজের লোকজনের বরাত দিয়ে বলেছেন।

গান করিলে যদি অপরাধ হয়
কোরান মজিদ কেন ভিন্ন এলহানে গায়।
রাগ রাগিনী সুর
রাগিনী বলিয়া মশহূর
এত আলাপন, আছে নিরাপন, তাতে হারাম কেন নয় ॥
আরবী পারসী সকল ভাষায়
গজল মরসিয়া সিদ্ধ হয়
নবীজী যখন মদীনায় যায়, 'দফ' বাজায়ে মদীনায় নেয় ॥
বেহেস্তের সুর নাজায়েজ নয়
দুনিয়ায় কেন হারাম হয়।[৪২]

যুক্তির তীক্ষ্ণতায় কবি ধর্মভিত্তিক নিয়ম কানুনকে প্রশ্নের মুখোমুখি করেছেন। সাধারণ ধর্মবেত্তাগণ বাদ্য-বাজনাসহ সঙ্গীতকে শরীয়ত বিরোধী বলে ঘোষণা করেছেন। তাই কবি বলেছেন আরবি ভাষায় গান করা যদি ধর্মবিরোধী না হয় তাহলে বাংলায় কেন হবে? এমনকি মহানবী যখন মদীনায় হিজরতে আসেন তখন তাকে 'ডফ' নামক চামড়া দ্বারা নির্মিত এক ধরনের বাদ্য বাজিয়ে স্বাগত জানানো হয়েছিল। পৃথিবীতে যারা ভাল কাজ করবে তারা মৃত্যুর পর বেহেশত লাভ করবে এবং সেখানে আরাম আয়েশের সঙ্গে আনন্দ

উপভোগ করতে পারবে এমনটাই বলা হয়। কবি এই বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পাল্টা প্রশ্ন করেছেন যে, বেহেশতে গান বাজনা যদি সিদ্ধ হয় তাহলে পৃথিবীতে কেন নয়?

মহম্মদের জন্ম যদি হতো এদেশে
বেহেশতের কোন্ ভাষা হ'তো, বলতো এসে ॥[৪৩]

ইসলাম ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম ধর্ম প্রচারকগণ ছিলেন আরবি ভাষী, ইসলামের মূল ধর্মগ্রন্থ আরবি ভাষায় রচিত, ইসলাম ধর্ম পালনার্থে যেসব আচার ক্রিয়া পালিত হয় তাও ভাষাগতভাবে আরবির দ্বারস্থ। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের সঙ্গে আরবি ভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কবি এর মূল কারণ হিসেবে ধর্ম প্রচারক মুহম্মদের জন্ম আরবে বলে উল্লেখ করেছেন। কবির যুক্তি, ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্ম প্রচারক মূল কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন বলে ধর্মে ব্যবহৃত ভাষাও তাঁর সুবিধা মতো তাঁর মাতৃভাষা হয়েছে। যদি ইসলাম ধর্ম প্রচারক বাংলাদেশের মানুষ হতেন তাহলে তিনি বাংলায় কথা বলতেন এবং ধর্মবিষয়ক সকল কথা বাংলায় রচিত ও প্রচারিত হত।

যদি খোদার ইচ্ছায় সন্তান হয়
বিধবা বন্ধ্যা নারী, কেন নাহি পায় ॥
নারী পুরুষ করল রমণ
তাতে হয় সন্তান ধারণ
খোদারে দোষ এখন, মিছে মনুরায় ॥[৪৪]

সন্তান জন্ম দানের মাধ্যমে মাতৃজন্ম সার্থক হয় বলে কথিত আছে। সন্তান জন্মদানের লক্ষে মাতা পিতার যৌন সম্পর্ক ধর্ম ও সমাজ স্বীকৃত। কেউ কেউ নারী পুরুষের রমণের চেয়েও সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখেন। কিন্তু কবি মনে করেন যে রমণীর সঙ্গে পুরুষের রমণ ব্যতীত কোন ক্রমেই সন্তান জন্ম দেয়া সম্ভব নয়। নিজ কথার পক্ষে যুক্তি হিসেবে তিনি বিধবা ও বন্ধ্যা নারীর কথা উল্লেখ করেছেন।

কাগজে চিনি শব্দ লেখা যায়
সেই কাগজ চাটিলে কি মুখ মিষ্টি হয় ॥
তেমনি শাস্ত্রে লিখা ঈশ্বর
রাত্র দিন পড়ে বেশুমার
পায় কেবা তার দীদার,বলো আমায় ॥[৪৫]

ধর্মশাস্ত্রে উল্লিখিত মতে, ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও করণীয় সম্পাদনের মাধ্যমে মহামহিম ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা সম্ভব। কিন্তু ইদানীং ধর্ম পালনার্থে আচরণীয় কর্ম সম্পাদনের চেয়ে শাস্ত্র পাঠকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কেউ কেউ ধর্মগ্রন্থ কণ্ঠস্থ করার মাধ্যমেই ইহজাগতিক পাপ মোচন করতে পারবেন বলে মনে করেন। কবি তাদের দিকে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করে বলেছেন যে এমনতর ধারণা সমৃদ্ধ হয়ে কেউ কি স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করতে পেরেছেন?

বাস্তবজীবনের সঙ্গে অমিলযুক্ত ধর্মগ্রন্থ পাঠের ফল কাগজে 'চিনি' শব্দ লিখে তা থেকে মিষ্টত্ব লাভ করার মতো বলে কবি ব্যঙ্গ করেছেন।

সাত

মানুষ তার নিজের মধ্যে যে প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য ধারণ করে সে বৈশিষ্ট্যই ধর্ম এমন মত পোষণ করেন অনেকে। এ কারণে মানুষ অধ্যয়ন বা জরিপই লোকধর্মে প্রাধান্য পায়। কঠোর শাস্ত্রীয় বিধিবিধান এবং সাধারণ্যে প্রচলিত ধর্মীয় রীতি-নীতির বিপরীতে অবস্থান নিয়ে শ্রেণী বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে এক করে দেখে লোকধর্ম। অন্যদিকে জন্মসূত্রে বা মান্যসূত্রে ব্যক্তির পালনীয় ধর্মে বিভিন্নতা দেখা যায়। পুরস্কার-শাস্তি, ভোগ-ত্যাগ, যুদ্ধ-শান্তি, পীড়ন-প্রতিকার, শোষণ-প্রত্যাশা প্রভৃতি যুগ্ম বৈপরীত্যের যুক্তিপূর্ণ অন্বয়ের মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক শ্রেণী ব্যবস্থার আশ্রয়ে মানুষ নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত। কেউ আপনার ধর্মকে সেরা জ্ঞানে তা পালনে ব্রতী আবার কেউ অন্যকে নিজ ধর্মে আকৃষ্ট করতে বিশেষ তৎপর।

জ্যান্তে কালী ঘরের মাঝে দেখ্‌লি না
পুতুল পূজে মলি হারে দিনকানা ॥
জ্যান্ত তারে না চিনিয়া
খড়ের বুন্দেয় ধর্ণা দিয়া
কি পেলি বল রে ভায়া, বল সোনা ॥[৪৬]

হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ অন্যান্য শক্তিপূজক জনগোষ্ঠী শক্তির দেবী কালীর উদ্দেশ্যে অপশক্তির হাত থেকে রক্ষাকল্পে অর্ঘ্য নিবেদন করে থাকে। এদের ধারণা যে, তারা রক্ষা মাতার শক্তির মাধ্যমে বলীয়ান হয়ে অপদেবতার ক্ষতির প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করে শুভবোধ সম্পন্ন কাজ করতে পারবে। তারা দেবীর কর্মক্ষেত্রকে নভোমণ্ডল থেকে ভূমণ্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত বলে মনে করে। দেবীর কল্পিত মূর্তির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে অপশক্তিকে বশে আনার প্রক্রিয়াকে কবি দুদ্দু শাহ্‌ অলীক কল্পনা বলে মনে করেছেন। কবি মনে করেন মানুষের মধ্যে অপশক্তি বিনাশক গুণ রয়েছে এবং তার সদ্ব্যবহারই শুভবোধের প্রকৃত প্রয়োগ। প্রকৃত বিষয় থেকে সরে অবাস্তবের দিকে দৌড়ানোকে কবি দিবালোকে না দেখার মতো অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। তাই খড়-মাটি দিয়ে তৈরি কল্পিত দেবী মূর্তির প্রতি কবি যুক্তির মাধ্যমে অনাস্থা প্রকাশ করেছেন।

মানুষ রেখে পূজে মলি খড়ের বোন্দা
এমন বেকুব কে দেখেছে এমন ধাঁধা ॥[৪৭]

পৃথিবীতে মানুষই সব, মানবতার ধর্মই প্রকৃত ধর্ম। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে নির্মাণ করেছেন এবং পৃথিবীর অন্য সবকিছুকে মানুষের সেবার নিমিত্তে তৈরি করেছেন— এসব কথা নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের জন্য। কিন্তু সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসীগণ ঈশ্বরের কল্পিত রূপের প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করেন এবং তাঁর ভজনা করেন। ঈশ্বরের এই

কল্পিত রূপ নির্মিত হয় বাঁশ, কাঠ, খড় ও মাটির সাহায্যে। মানবতার ধর্মকে অপ্রধান ভেবে অর্থাৎ মানবসেবাকে তুচ্ছজ্ঞান করে সাকার ঈশ্বরে সকল আস্থা স্থাপনকে ধাঁধার মতো গোলমেলে বলে মনে করেন কবি।

কে জানে মলে জীব যাবে কোথায়
হাতের কাছে পেলে যারে দেখ গো তায় ॥
দূরের অন্নের লোভে রে ভাই
কাছের চিড়ে হারালে তাই
এমন বোকা আর দেখি নাই, এই দুনিয়ায় ॥[৪৮]

শাস্ত্রনির্ভর ধর্মগুলিতে মানুষের যাপিত জীবনকে ইহলোক আর আত্মা-বিয়োজিত অবস্থাকে পরলোক বলা হয়। ইহলোকে সৎকাজ করলে মানুষ পরলোকে তার সুফল ভোগ করবে বলে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ পারলৌকিক জীবনে সুখ সমৃদ্ধির হাতছানি দেখিয়ে মানুষকে অসৎকাজ থেকে দূরে রাখা হয় আর অশুভ শক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ততা কঠিনতম শাস্তির সম্মুখীন করবে বলে সতর্ক করা হয়। কিন্তু কবির ধারণা শাস্ত্রনির্ভর শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের মানবীয় গুণাবলীর বিকাশমানতাকে রোধ করা হয়। ইহলোকে কোন খারাপ কাজ করলে তার প্রায়শ্চিত্তও মানুষের জীবিতাবস্থায়ই হওয়া উচিত বলে কবি বিশ্বাস করেন। তাঁর ধারণায় পারলৌকিক সুখ-সমৃদ্ধি আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে যারা ইহকালের চেয়ে পরকালকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন তাদের বোকার স্বর্গে বাস বলে কবি উল্লেখ করেছেন:

মানুষ আর ঈশ্বর দু'জন
দুই দেশে বাস ভাবে যে জন
ঈশ্বরে সে পায় না কখন, ভাবার ধাঁধায়
ব্রত হল মানুষ যার
সেই জানে ঈশ্বরের কারবার।[৪৯]

মানবতাবাদী কবি দুদ্দু শাহ্ সাকার ও নিরাকার কোন রকম ঈশ্বরেই বিশ্বাস করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন যে মানুষকে সৃষ্টিকর্তা আপন গুণাবলির সাহায্যে নির্মাণ করেছেন। উপাদান কেন্দ্রিক গুণাবলির ভিন্নতা যেহেতু নাই সেহেতু মানুষের মাঝেই ঈশ্বরের বসবাস হওয়া উচিত বলে কবি মনে করেন। তাই ঈশ্বরের সন্ধান লাভ করতে হলে অবশ্যই মানুষের মধ্যে তাঁকে খুঁজতে হবে। সৎ মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ও প্রয়োগ ঐশ্বরিক উচ্চতায় মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করে থাকে। গানের মাধ্যমে কবি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন যে, মানবীয় গুণাবলির বিকাশের মাধ্যমেই ঈশ্বরকে আপনার অস্তিত্বে ধারণ করা সম্ভব।

কাশী কিংবা মক্কায় যাওরে মন
দেখতে পাবে মানুষের বদন
ধ্যান ধারণা ভজন পূজন, মানুষ নিধি সর্ব ঠাঁই ॥[৫০]

হিন্দু কাশীকে এবং মুসলমান মক্কাকে ধর্মীয় তীর্থস্থান হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। ঈশ্বরকে আপনার অস্তিত্বে পাবার নেশায় মানুষ তীর্থ ভ্রমণ করে থাকে। তীর্থস্থান ভ্রমণ ঈশ্বরকে পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে তারা মনে করে। এছাড়া ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের নিমিত্তে তারা নানা আচার পালন করে থাকে। লোকে লোকারণ্য তীর্থভূমিতে মানুষের আত্ম প্রকাশের অস্থিরতা, অবিচল ধৈর্য, ধারণার গভীরতা, নৈবেদ্য উৎসর্গের হৃদয় নিংড়ানো আন্তরিকতা সবই সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কবি নিজের বিশ্বাসকে পুঁজি করে আবারও বলেছেন যে সর্বত্রই মানুষের চেহারা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না তিনি।

মানুষের আকার ধরে
খোদ খোদা যে ঘোরে ফেরে
যবন কাফের বলে কারে, দিলে গো তাড়াই ॥
দেখিয়া মানুষের দশা
দুদ্দুর মুখে নাই গো ভাষা।[৫১]

সৃষ্টিকর্তা আপন সত্তার অংশবিশেষের সাহায্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ মানবীয় গুণাবলির সবগুলিতেই স্রষ্টার সংস্পর্শ রয়েছে। আরও স্পষ্ট করে বললে মানুষের মাঝেই সৃষ্টিকর্তার বসবাস। এরই মধ্যে মানুষ জাত বিভাজন করেছে কিংবা অন্যকে জাত্যন্তর করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। স্বীয় মানবীয় গুণাবলি বিকাশের মাধ্যমে যেখানে স্রষ্টার সন্ধান পাওয়া যায় সেখানে অন্যকে গালি দেওয়া নিতান্তই অন্যায়। কিন্তু আজকাল মানুষ নিজের উন্নয়নের চেয়ে অপরের ক্ষতি করা বা অপর সম্বন্ধীয় বিষয়াদি নিয়ে ভাবতে বেশি উৎসাহী। ফলে প্রতিনিয়ত মানবীয় গুণাবলী বিকাশের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে আসছে। তাই কবি দুদ্দু শাহ্ হতাশায় ভাষাহীন।

কত মত দেখি এদেশে
ঘোষ পাড়া শম্ভুচাঁদে এদেশ জুড়ে গেছে ॥
লেংটি আঁটা বৈষ্টম বাবাজী
সঙ্গে নিয়ে কত মাতাজী
গাজা খেয়ে হয়ে গাজী, ফেরে দেশে বিদেশে ॥
পাদরী সাহেব বলে
এসো ভাই সব যীশুর দলে
স্বর্গ ঈশ্বর পথে সকলে, আর শুকর খেয়ে ॥
টুপিওয়ালা তাবিজ বেচা
মুসলমানের এই দুর্দশা।[৫২]

একই ভূখণ্ডে বিভিন্ন ধর্মের লোকজনের বসবাসের চিত্র কবি এখানে তুলে ধরেছেন। হিন্দু, বৈষ্ণব, খ্রিস্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকজনের অনেকেই ধর্মীয় মূল সুর থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। এই বিচ্যুতি শুধু ধর্মীয় বিচ্যুতি নয়, ব্যক্তির আপন গুণাবলি থেকেও

সরে আসা। তাই নারী সংসর্গ, গঞ্জিকা সেবন করে মাতাল হওয়া, শুকরের মাংস খাওয়া কিংবা টুপি পরে তাবিজ বিক্রি সবই ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর বলে কবি মনে করেন। ধর্ম কোন খারাপ শিক্ষা দেয়না বলে কবি বিশ্বাস করেন। ফলে তাঁর ধারণা ব্যক্তিগত এসব আচরণের মাধ্যমে ব্যক্তির পাশাপাশি ধর্মীয় মূল্যবোধও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নদের গোরা চৈতন্য যারে কয়
শাক্ত ভারতীর কাছে মুক্তি মন্ত্র পায় ॥
গিয়ে রামানন্দের কাছে
বাউল ধর্মের তত্ত্ব পোছে
তবে তো মানুষ ভজে, পরমতত্ত্ব পায় ॥
বাউল এক চণ্ডীদাসে
মানুষের কথা প্রকাশে
সেই তত্ত্ব ভাই অবশেষে, বৈষ্ণবেরা নেয় ॥
মর্কট বৈরাগী যারা
এক অক্ষর না পায় গো তারা
গীতা ভাগবত পড়া, পণ্ডিত সদায় ॥
তিলক মালা কৌপিন আটার দল
জানে না হে তারা এ সকল।[৫৩]

আট

ন্যায়বোধ ও মানবীয় গুণাবলীর পরাকাষ্ঠায় সমুত্তীর্ণ দুদ্দু শাহ্ যেমন গুরুভক্ত ছিলেন তেমনি তাঁর গুরু লালনও ছিলেন শিষ্যের প্রতি উদার। গুরুমুখী বিদ্যায় বাউল দুদ্দু শাহ্‌র অর্জন অসামান্য। সামাজিক ইতিহাসের পরতে পরতে সমাজ জীবনের যে চিত্ররূপ বাঙ্ময় হয়ে ওঠে তা তাঁর গানের মূল উপজীব্য। সমাজতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গেই নৃতত্ত্বের বিষয়গুলি পরিস্ফুটিত হয়েছে। যুক্তির কলকাঠি যতটা নড়াচড়া করেছে ঠিক ততটাই নড়ে বসেছে দর্শন। সর্বজনীন মানবীয় চেতনায় উদ্দীপিত দুদ্দু শাহ্ তাঁর সমকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়াদির ব্যাখ্যায় পরম যুক্তিবাদী। তাঁর ধর্মবোধ পুণ্য আর স্বর্গপ্রাপ্তির অলীক স্বপ্ন কল্পনায় বিভোর নয়— তা বাস্তবানুগ, জীবনমুখী আর মানবীয়তায় সমুজ্জ্বল।

তথ্যসূচি:

---

১ জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান সম্পাদিত, *বাউল গান ও দুদ্দু শাহ্*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৩৭১, পৃ. ম

২ রহমান, এস.এম. লুৎফর, *দুদ্দু শাহ্*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯, পৃ. ১৩
৩ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৭৮, পৃ. ৮০৭
৪ রহমান, এস.এম. লুৎফর, *দুদ্দু শাহ্*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯, পৃ. ১২
৫ জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান সম্পাদিত, *বাউল গান ও দুদ্দু শাহ্*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৩৭১, পৃ. ৭৫
৬ তদেব, পৃ.
৭ হোসেন, সেলিনা এবং ইসলাম, নূরুল সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ১৯২
৮ রহমান, এস.এম. লুৎফর, *দুদ্দু শাহ্*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ২৬
৯ জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান সম্পাদিত, *বাউল গান ও দুদ্দু শাহ্*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৩৭১, পৃ. ২৮
১০ তদেব, পৃ. ৮১
১১ তদেব, পৃ. ৫৬
১২ তদেব, পৃ. ১৪৪
১৩ তদেব,পৃ. ৫৬
১৪ তদেব, পৃ. ৬৯
১৫ তদেব, পৃ. ৫৫
১৬ তদেব, পৃ. ৬৪
১৭ তদেব, পৃ. ৫৮
১৮ তদেব, পৃ. ৫৮
১৯ তদেব, পৃ. ৫১
২০ তদেব, পৃ. ৪৭
২১ তদেব, পৃ. ৬৩
২২ তদেব, পৃ. ৬৫
২৩ তদেব, পৃ. ৫০
২৪ বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, *বাংলার লৌকিক দেবতা*, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮, পৃ. ৬১
২৫ যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ সম্পাদিত , *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান*, প্রথম দিব্যপ্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ১১৪
২৬ তদেব, পৃ. ৬৯
২৭ তদেব, পৃ. ৭৫
২৮ তদেব, পৃ. ৭৬
২৯ তদেব, পৃ. ৪৮-৪৯
৩০ তদেব, পৃ. ৩৮
৩১ তদেব, পৃ. ২০-২১
৩২ তদেব, পৃ. ২২
৩৩ তদেব, পৃ. ২৪
৩৪ তদেব, পৃ. ৫২
৩৫ তদেব, পৃ. ৭৪
৩৬ তদেব, পৃ. ২৪-২৫
৩৭ তদেব, পৃ. ২৬
৩৮ তদেব, পৃ. ৫০
৩৯ তদেব, পৃ. ৫৭
৪০ তদেব, পৃ. ৫৩

৪১ তদেব, পৃ. ৫১
৪২ তদেব, পৃ. ৬২
৪৩ তদেব, পৃ. ৭১
৪৪ তদেব, পৃ. ৭৪
৪৫ তদেব, পৃ. ৭৭
৪৬ তদেব, পৃ. ২৯
৪৭ তদেব, পৃ. ৭৩
৪৮ তদেব, পৃ. ৫৯
৪৯ তদেব, পৃ. ৫৯
৫০ তদেব, পৃ. ৫৯
৫১ তদেব, পৃ. ৫৯
৫২ তদেব, পৃ. ৪৭
৫৩ তদেব, পৃ. ৬৬